একবিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গে প্রাণকৃষ্ণ, মাস্টার, রাম, গিরীন্দ্র, গোপাল

শনিবার, ২৪শে চৈত্র (১২৯০, শুক্লা দশমী) ইং ৫ই এপ্রিল, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ; প্রাতঃকাল বেলা আটটা। মাস্টার দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যবদন, কক্ষমধ্যে ছোট খাটটির উপরে উপবিষ্ট। মেঝেতে কয়েকটি ভক্ত বসিয়া; তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

প্রাণকৃষ্ণ জনাইয়ের মুখুজ্জেদের বংশসম্ভূত। কলিকাতায় শ্যামপুকুরে বাড়ি। ম্যাকেঞ্জি লায়ালের এক্‌স্‌চেঞ্জ নামক নিলাম ঘরের কার্যাধ্যক্ষ। তিনি গৃহস্থ, কিন্তু বেদান্তর্চচায় বড় প্রীতি। পরমহংসদেবকে বড় ভক্তি করেন ও মাঝে মাঝে আসিয়া দর্শন করেন। ইতিমধ্যে একদিন নিজের বাড়িতে ঠাকুরকে লইয়া গিয়া মহোৎসব করিয়াছিলেন। তিনি বাগবাজারের ঘাটে প্রত্যহ প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিতেন ও নৌকা সুবিধা হইলেই একেবারে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতেন। আজ এইরূপ নৌকা ভাড়া করিয়াছিলেন। নৌকা কূল হইতে একটু অগ্রসর হইলেই ঢেউ হইতে লাগিল। মাস্টার বলিলেন, আমায় নামাইয়া দিতে হইবে। প্রাণকৃষ্ণ ও তাঁহার বন্ধু অনেক বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি কোন মতে শুনিলেন না; বলিলেন, "আমায় নামাইয়া দিতে হইবে, আমি হেঁটে দক্ষিণেশ্বরে যাব।" অগত্যা প্রাণকৃষ্ণ তাঁহাকে নামাইয়া দিলেন।

মাস্টার পৌঁছিয়া দেখেন যে, তাঁহারা কিয়ৎক্ষণ পূর্বে পোঁছিয়াছেন ও ঠাকুরের সঙ্গে সদালাপ করিতেছেন। ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া তিনি একপাশে বসিলেন।

[*অবতারবাদ* ***Humanity and Divinity of Incarnation***]

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রাণকৃষ্ণের প্রতি) -- কিন্তু মানুষে তিনি বেশি প্রকাশ। যদি বল অবতার কেমন করে হবে, যাঁর ক্ষুধা তৃষ্ণা এই সব জীবের ধর্ম অনেক আছে, হয়তো রোগশোকও আছে; তার উত্তর এই যে, "পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।"

"দেখ না রামচন্দ্র সীতার শোকে কাতর হয়ে কাঁদতে লাগলেন। আবার হিরণ্যাক্ষ বধ করবার জন্য বরাহ অবতার হলেন। হিরণ্যাক্ষ বধ হল, কিন্তু নারায়ণ স্বধামে যেতে চান না। বরাহ হয়ে আছেন। কতকগুলি ছানাপোনা হয়েছে। তাদের নিয়ে একরকম বেশ আনন্দে রয়েছেন। দেবতারা বললেন, এ কি হল, ঠাকুর যে আসতে চান না। তখন সকলে শিবের কাছে গেল ও ব্যাপারটি নিবেদন করলে। শিব গিয়া তাঁকে অনেক জেদাজেদি করলেন, তিনি ছানাপোনাদের মাই দিতে লাগলেন। (সকলের হাস্য) তখন শিব ত্রিশূল এনে শরীরটা ভেঙে দিলেন। ঠাকুর হি-হি করে হেসে তখন স্বধামে চলে গেলেন।"

প্রাণকৃষ্ণ (ঠাকুরের প্রতি) -- মহাশয়! অনাহত শব্দটি কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ -- অনাহত শব্দ সর্বদাই এমনি হচ্ছে। প্রণবের ধ্বনি। পরব্রহ্ম থেকে আসছে, যোগীরা শুনতে পায়। বিষয়াসক্ত জীব শুনতে পায় না। যোগী জানতে পারে যে, সেই ধ্বনি একদিকে নাভি থেকে উঠে ও আর-একদিকে সেই ক্ষীরোদশায়ী পরব্রহ্ম থেকে উঠে।

[পরলোক সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কেশব সেনের প্রশ্ন]

প্রাণকৃষ্ণ -- মহাশয়! পরলোক কিরকম?

শ্রীরামকৃষ্ণ -- কেশব সেনও ওই কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। যতক্ষণ মানুষ অজ্ঞান থাকে, অর্থাৎ যথক্ষণ ঈশ্বরলাভ হয় নাই, ততক্ষণ জন্মগ্রহণ করতে হবে। কিন্তু জ্ঞানলাভ হলে আর এ-সংসারে আসতে হয় না। পৃথিবীতে বা অন্য কোন লোকে যেতে হয় না।

"কুমোরেরা হাঁড়ি রৌদ্রে শুকুতে দেয়। দেখ নাই, তার ভিতর পাকা হাঁড়িও আছে, কাঁচা হাঁড়িও আছে? গরু-টরু চলে গেলে হাঁড়ি কতক কতক ভেঙে যায়। পাকা হাঁড়ি ভেঙে গেলে কুমোর সেগুলিকে ফেলে দেয়, তার দ্বারা আর কোন কাজ হয় না। কাঁচা হাঁড়ি ভাঙলে কুমোর তাদের আবার লয়; নিয়ে চাকেতে তাল পাকিয়ে দেয়, নূতন হাঁড়ি তৈয়ার হয়। তাই যতক্ষণ ঈশ্বরদর্শন হয় নাই, ততক্ষণ কুমোরের হাতে যেতে হবে, অর্থাৎ এই সংসারে ফিরে ফিরে আসতে হবে।

"সিদ্ধ ধান পুঁতলে কি হবে? গাছ আর হয় না। মানুষ জ্ঞানাগ্নিতে সিদ্ধ হলে তার দ্বারা আর নূতন সৃষ্টি হয় না, সে মুক্ত হয়ে যায়।"

[বেদান্ত ও অহংকার -- বেদান্ত ও 'অবস্থাত্রয়সাক্ষী' -- জ্ঞান ও বিজ্ঞান]

"পুরাণ মতে ভক্ত একটি, ভগবান একটি; আমি একটি, তুমি একটি; শরীর যেন সরা; এই শরীরমধ্যে মন, বুদ্ধি, অহংকাররূপ জল রয়েছে; ব্রহ্ম সূর্যস্বরূপ। তিনি এই জলে প্রতিবিম্বিত হচ্ছেন। ভক্ত তাই ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করে।

"বেদান্ত (বেদান্তদর্শন) মতে ব্রহ্মাই বস্তু, আর সমস্ত মায়া, স্বপ্নবৎ অবস্তু। অহংরূপ একটি লাঠি সচ্চিদানন্দ-সাগরের মাঝখানে পড়ে আছে। (মাস্টারের প্রতি) -- তুমি এইটে শুনে যাও -- অহং লাঠিটি তুলে নিলে এক সচ্চিদানন্দ-সমুদ্র। অহং লাঠিটি থাকলে দুটো দেখায়, এ একভাগ জল ও একভাগ জল। ব্রহ্মজ্ঞান হলে সমাধিস্থ হয়। তখন এই অহং পুঁছে যায়।

"তবে লোকশিক্ষার জন্য শঙ্করাচার্য 'বিদ্যার আমি' রেখেছিলেন।

(প্রাণকৃষ্ণের প্রতি) -- "কিন্তু জ্ঞানীর লক্ষণ আছে। কেউ কেউ মনে করে, আমি জ্ঞানী হয়েছি। জ্ঞানীর লক্ষণ কি? জ্ঞানী কারু অনিষ্ট করতে পারে না। বালকের মতো হয়ে যায়। লোহার খড়্গ যদি পরশমণি ছোঁয়ানো হয়, খড়্গ সোনা হয়ে যায়। সোনায় হিংসার কাজ হয় না। বাহিরে হয়তো দেখায় যে, রাগ আছে, কি অহংকার আছে, কিন্তু বস্তুতঃ জ্ঞানীর ও-সব কিছু থাকে না।

"দূর থেকে পোড়া দড়ি দেখলে বোধ হয়, ঠিক একগাছা দড়ি পড়ে আছে। কিন্তু কাছে এসে ফুঁ দিলে সব উড়ে যায়। ক্রোধের আকার, অহংকারের আকার কেবল। কিন্তু সত্যকার ক্রোধ নয়, অহংকার নয়।

"বালকের আঁট থাকে না। এই খেলাঘর করলে, কেউ হাত দেয় তো ধেই ধেই করে নেচে কাঁদতে আরম্ভ করবে। আবার নিজেই ভেঙে ফেলবে সব। এই কাপড়ে এত আঁট, বলছে 'আমার বাবা দিয়েছে, আমি দেব না।'

আবার একটা পুতুল দিলে পরে ভুলে যায়, কাপড়খানা ফেলে দিয়ে চলে যায়।

“এইসব জ্ঞানীর লক্ষণ। হয়তো বাড়িতে খুব ঐশ্বর্য; কোচ, কেদারা, ছবি, গাড়ি-ঘোড়া; আবার সব ফেলে কাশী চলে যাবে।

“বেদান্তমতে জাগরণ অবস্থাও কিছু নয়। এক কাঠুরে স্বপন দেখেছিল। একজন লোক তার ঘুম ভাঙানোতে সে বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, ‘তুই কেন আমার ঘুম ভাঙালি? আমি রাজা হয়েছিলাম, সাত ছেলের বাপ হয়েছিলাম। ছেলেরা সব লেখাপড়া, অস্ত্রবিদ্যা সব শিখছিল। আমি সিংহাসনে বসে রাজত্ব করছিলাম। কেন তুই আমার সুখের সংসার ভেঙে দিলি?’ সে ব্যক্তি বললে, ‘ও তো স্বপন, ওতে আর কি হয়েছে।’ কাঠুরে বললে, ‘দূর! তুই বুঝিস না, আমার কাঠুরে হওয়া যেমন সত্য, স্বপনে রাজা হওয়াও তেমনি সত্য। কাঠুরে হওয়া যদি সত্য হয়, তাহলে স্বপনে রাজা হওয়াও সত্য’।”

প্রাণকৃষ্ণ জ্ঞান জ্ঞান করেন, তাই বুঝি ঠাকুর জ্ঞানীর অবস্থা বলিতেছিলেন। এইবার ঠাকুর বিজ্ঞানীর অবস্থা বলিতেছেন। ইহাতে কি তিনি নিজের অবস্থার ইঙ্গিত করিতেছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ -- ‘নেতি’ ‘নেতি’ করে আত্মাকে ধরার নাম জ্ঞান। ‘নেতি’ ‘নেতি’ বিচার করে সমাধিস্থ হলে আত্মাকে ধরা যায়।

“বিজ্ঞান -- কিনা বিশেষরূপে জানা। কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ দুধ খেয়েছে। যে কেবল শুনেছে, সে অজ্ঞান। যে দেখেছে সে জ্ঞানী; যে খেয়েছে তারই বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষরূপে জানা হয়েছে। ঈশ্বরদর্শন করে তাঁর সহিত আলাপ, যেন তিনি পরমাত্মীয়; এরই নাম বিজ্ঞান।

“প্রথমে ‘নেতি’ ‘নেতি’ করতে হয়। তিনি পঞ্চভূত নন; ইন্দ্রিয় নন; মন, বুদ্ধি, অহংকার নন; তিনি সকল তত্ত্বের অতীত। ছাদে উঠতে হবে, সব সিঁড়ি একে একে ত্যাগ করে যেতে হবে। সিঁড়ি কিছু ছাদ নয়। কিন্তু ছাদের উপর পৌঁছে দেখা যায় যে, যে জিনিসে ছাদ তৈয়ারী, ইট, চুন, সুড়কি -- সেই জিনিসেই সিঁড়িও তৈয়ারী। যিনি পরব্রহ্ম তিনিই এই জীবজগৎ হয়েছেন, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। যিনি আত্মা, তিনিই পঞ্চভূত হয়েছেন। মাটি এত শক্ত কেন, যদি আত্মা থেকেই হয়েছে। তাঁর ইচ্ছাতে সব হতে পারে। শোণিত শুক্র থেকে যে হাড় মাংস হচ্ছে! সমুদ্রের ফেণা কত শক্ত হয়!”

[*গৃহস্থের কি বিজ্ঞান হতে পারে -- সাধন চাই*]

“বিজ্ঞান হলে সংসারে থাকা যায়। তখন বেশ অনুভব হয় যে, তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন, তিনি সংসার ছাড়া নন। রামচন্দ্র যখন জ্ঞানলাভের পর ‘সংসারে থাকব না’ বললেন, দশরথ বশিষ্ঠকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন, বুঝাবার জন্য। বশিষ্ঠ বললেন, ‘রাম! যদি সংসার ঈশ্বর ছাড়া হয়, তুমি ত্যাগ করতে পারো।’ রামচন্দ্র চুপ করে রইলেন। তিনি বেশ জানেন যে ঈশ্বর ছাড়া কিছুই নাই। তাঁর আর সংসার ত্যাগ করা হল না। (প্রাণকৃষ্ণের প্রতি) কথাটা এই, দিব্য চক্ষু চাই। মন শুদ্ধ হলেই সেই চক্ষু হয়। দেখ না কুমারীপূজা। হাগা-মোতা মেয়ে, তাকে ঠিক দেখলুম সাক্ষাৎ ভগবতী। একদিকে স্ত্রী, একদিকে ছেলে, দুজনকেই আদর কচ্ছে, কিন্তু ভিন্ন ভাবে। তবেই হলো, মন নিয়ে কথা। শুদ্ধমনেতে এক ভাব হয়। সেই মনটি পেলে সংসারে ঈশ্বরদর্শন হয়; তবেই সাধন চাই।

“সাধন চাই। ... এইটি জানা যে, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সহজেই আসক্তি হয়। স্ত্রীলোক স্বভাবতঃই পুরুষকে

ভালবাসে। পুরুষ স্বভাবতঃই স্ত্রীলোক ভালবাসে -- তাই দুজনেই শিগগির পড়ে যায়।

"কিন্তু সংসারে তেমনি খুব সুবিধা। বিশেষ দরকার হলে, হলো স্বদারা সহবাস করলে। (সহাস্য) মাস্টার হাসচো কেন?"

মাস্টার (স্বগত) -- সংসারী লোক একেবারে সমস্ত ত্যাগ পেরে উঠবে না বলে ঠাকুর এই পর্যন্ত অনুমতি দিচ্ছেন। ষোল আনা ব্রহ্মচর্য সংসারে থেকে কি একেবারে অসম্ভব?

(হঠযোগীর প্রবেশ)

পঞ্চবটীতে একটি হঠযোগী কয়দিন ধরিয়া আছেন। তিনি কেবল দুধ খান, আফিম খান, আর হঠযোগ করেন, ভাত-টাত খান না। আফিমের ও দুধের পয়সার অভাব। ঠাকুর যখন পঞ্চবটীর কাছে গিয়াছিলেন, হঠযোগীর সহিত আলাপ করিয়া আসিয়াছিলেন। হঠযোগী রাখালকে বলিলেন, "পরমহংসজীকে বলে যেন আমার কিছু ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।" ঠাকুর বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, "কলকাতার বাবুরা এলে বলে দেখব।"

হঠযোগী (ঠাকুরের প্রতি) -- আপ্ রাখালসে কেয়া বোলাথা?

শ্রীরামকৃষ্ণ -- হ্যাঁ বলেছিলাম, দেখব যদি কোন বাবু কিছু দেয়। তা কই (প্রাণকৃষ্ণাদির প্রতি) তোমরা বুঝি এদের like কর না?

প্রাণকৃষ্ণ চুপ করিয়া রহিলেন।

(হঠযোগীর প্রস্থান)

ঠাকুরের কথা চলিতে লাগিল।